Vol. 53 | No. 1 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের বিভিন্ন সংস্করণ : পরিবর্তনের প্রকৃতি

Volume	53
Issue	1
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	স্বরোচিষ সরকার
Published online	October 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v53i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i1.1
Pages	১-১১
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের বিভিন্ন সংস্করণ : পরিবর্তনের প্রকৃতি

স্বরোচিষ সরকার*

১. ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের অন্তত ১৩টি সংস্করণ প্রকাশিত হয় লেখকের জীবদ্দশায়। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে; দ্বিতীয় সংস্করণ সম্ভবত ১৮৬৭ সালে, তৃতীয়টি ১৮৬৯ সালে, চতুর্থটি ১৮৭১ সালে, পঞ্চমটি ১৮৭৪ সালে, ষষ্ঠটি ১৮৭৬ সালে, সপ্তমটি ১৮৭৯ সালে, অষ্টমটি ১৮৮১ সালে, নবমটি ১৮৮৩ সালে, দশমটি ১৮৮৪ সালে, একাদশটি ১৮৮৮ সালে, দ্বাদশটি সম্ভবত ১৮৯০ সালে, এবং ত্রয়োদশটি ১৮৯৩ সালে। এছাড়া ১৮৮১ সালে এই উপন্যাসের একটি রোমানীকৃত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বঙ্কিম রচনাবলি সম্পাদনার সময়ে যোগেশচন্দ্র বাগল ১৮৯৩ সালের সংস্করণকে গ্রহণ করেছিলেন। অন্য সংস্করণগুলোর কপি পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রয়েছে। প্রথম সংস্করণের একটি কপি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। দ্বিতীয় সংস্করণের একটি কপি, এবং রোমানীকৃত সংস্করণের একটি কপিও এই গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়। সংস্করণগুলোকে পাশাপাশি রাখলে বোঝা যায়, এর অনেকগুলোই সরাসরি পুনর্মুদ্রণ। তবে উপন্যাসটির দ্বিতীয় সংস্করণে এবং শেষ সংস্করণে প্রচুর পরিমাণে সংশোধন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন ঘটে। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের এই দুই সংস্করণের সঙ্গে প্রথম সংস্করণের তথা ১৮৬৫ সালের প্রথম মুদ্রণের পাঠগত পরিবর্তনের প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

১৮৬৫ সাল থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের পাঠগত পরিবর্তনকে অন্তত তিন ভাগে বিভক্ত করে দেখা যায়। এক. ভাষাগত পরিবর্তন; দুই. আদর্শগত পরিবর্তন; এবং তিন. তথ্যগত পরিবর্তন।

*ড. স্বরোচিষ সরকার, অধ্যাপক (বাংলা), ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। swarocish@yahoo.com

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ ও পরবর্তী সংস্করণের মধ্যে যে বিস্তর তফাত রয়েছে, এ বিষয়ে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীকার শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।[১] অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যও এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর বইয়ের 'ভূমিকা' পড়ে মনে হয় তিনি উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণ ব্যবহার করতে পারেননি।[২] সারোয়ার জাহান তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : মূল্যায়নের পালাবদল' গ্রন্থে প্রথমবার এই পরিবর্তনের কয়েকটি নমুনা উপস্থাপন করেছিলেন।[৩] এইসব আলোচনা থেকে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যকার পরিবর্তন আগ্রহব্যঞ্জকতা তৈরি করে।[৪]

২. প্রথম সংস্করণের বিবরণ

আলোচনার শুরুতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের দুর্লভ কপিটি সম্পর্কে দু-চার কথা বলা যাক। আখ্যাপত্র অনুযায়ী এর নাম: 'দুর্গেশনন্দিনী : ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩০৭। ছাপা হয়েছিলো আপার সার্কুলার রোডের বিদ্যারত্ন যন্ত্রে। মূল্য এক টাকা। কপিটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর গ্রন্থাগারে এসেছে যদুনাথ সরকারের করচমারিয়া গ্রামের পারিবারিক গ্রন্থাগার থেকে। বইয়ের আখ্যাপত্রে মেদিনীপুর জেলা কালেক্টরেটের একটি তারিখযুক্ত ছাপ আছে; তারিখ : ১৩ জুন ১৯৩৮।

১৯৪০-এর দশকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের একটি শতবার্ষিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর ভূমিকা লিখেছিলেন যদুনাথ সরকার। এই ভূমিকা রচনার কাজে যদুনাথ সরকার মেদিনীপুর জেলার কোনো কর্মকর্তার মাধ্যমে কপিটি সংগ্রহ করে থাকবেন, যা পরে তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগারে জায়গা পায়।

একাধিক কারণে কপিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম কারণ, আলোচকের জানামতে, বাংলাদেশ ও ভারতের কোনো গ্রন্থাগারে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের অন্য কোনো কপি নেই। দ্বিতীয় কারণ, এই কপিটির বিভিন্ন জায়গায় কলমের কালি দিয়ে নানা ধরনের সংশোধন হাতের লেখায় চিহ্নিত; এবং তা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের হওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয় কারণটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। ব্যাখ্যা ১ : ১৮৮০-এর দশকে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরে চাকরি করেছেন। সেখানে বসে বইটির শেষ সংস্করণের কাজ তিনি শুরু করতে পারেন। কেননা এখান থেকেই বইটি যদুনাথ সরকারের হাতে আসে। ব্যাখ্যা ২: বইটিতে 'আ', 'ন', 'ম', 'শ' প্রভৃতি বর্ণের লিখন-পদ্ধতি বঙ্কিমচন্দ্রের হাতের লেখার খুব কাছাকাছি। ব্যাখ্যা ৩: এই উপন্যাসের ৩০০ ও ৩০১ পৃষ্ঠার তিনটি অনুচ্ছেদকে

ডিলিট করার জন্য প্রথমে চিহ্নিত করা হয়, পরে সেখানে রোমান লেটারে স্টেট (stet), অর্থাৎ ডিলিট করার প্রয়োজন নেই, এমন সংকেত ব্যবহার করা হয়। লেখক ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এমন চিহ্ন দেওয়া অসম্ভব।

মনে হয় উপন্যাসটির শেষ সংস্করণের কাজে বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন সংস্করণের কোনো একটি কপিকে প্রেসকপি হিসেবে তৈরি করেছিলেন এবং প্রথম সংস্করণের এই কপিটির সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখেছিলেন। কাজটি খুব সময়সাপেক্ষ। তাই এই কাজে তিনি কোনো সহযোগীর সহায়তা নিয়ে থাকতে পারেন। হাতের লেখাটা সম্ভাব্য সেই সহযোগীরও হওয়া সম্ভব।

সর্বশেষ সংস্করণ যে দ্বিতীয় সংস্করণের উপরে নির্মিত, প্রথম সংস্করণের উপরে নয়, তার একটি বড়ো প্রমাণ "ছাড়"।[৫] দ্বিতীয় সংস্করণের সময়ে প্রথম সংস্করণের দুটি ছাড় যায়। প্রথমটি প্রথম সংস্করণের ১০৬ পৃষ্ঠার। এখানে একটি লাইনে 'বিমলা' রয়েছে। ঠিক পরের লাইনের একটু ডান দিকে আর একবার 'বিমলা' রয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণের সময়ে প্রথম 'বিমলা' থেকে দ্বিতীয় 'বিমলা' পর্যন্ত মুদ্রিত হয়নি। বর্জিত অংশটি ছিলো এ রকম: "বিমলা ঐ জানেলার উপর উঠিলেন। জানেলার কবাটে একটি গাচাবির কল বাহির দিকে লাগান ছিল।" প্রাসঙ্গিক বর্ণনায় এই অংশটুকু অপরিহার্য। কিন্তু ছাড় যাওয়ার ফলে তৃতীয় সংস্করণ থেকে এখানে এটুকু বাদ দিয়েই বর্ণনা শেষ করা হয়েছে। তাতে খানিকটা অস্পষ্টতা রয়ে গেছে।

৩. ভাষিক সংস্কার

ভাষার ব্যাপারে বঙ্কিম যে যথেষ্ট খুঁতখুঁতে স্বভাবের ছিলেন, তা নিয়ে অনেকে আলোচনা করেছেন।[৬] তাঁর এই স্বভাব কতোটা প্রবল ছিলো 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের একাধিক সংস্করণ থেকে তা ভালোভাবেই আঁচ করা যায়। কখনো তিনি সমকালীন ব্যাকরণ অনুযায়ী অশুদ্ধ বিবেচনা থেকে সংশোধন করেছিলেন, কখনো সহজবোধ্য করতে সংশোধন করেছিলেন, কখনো অন্যের সমালোচনাকে বিবেচনায় এনে সংশোধন করেছিলেন, কখনো শ্রুতিমধুর করতে সংশোধন করেছিলেন, আবার কখনো সমকালীন ব্যাকরণ থেকে সমকালের প্রচলনকে অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে সংশোধন করেছিলেন। ভাষিক এই সংস্কারকাজ দ্বিতীয় সংস্করণ তো বটেই সর্বশেষ সংস্করণেও লক্ষ করা যায়।[৭] প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত ভাষার কোন কোন দিক বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কারযোগ্য মনে করেছিলেন, তার দু-একটি উদাহরণ তুলে ধরা যাক।

প্রথম সংস্করণে লিখেছিলেন 'অলঙ্কারসংনিবেশ', 'তৎশ্রবণে', 'সঙ্কোচিত', 'সম্বাদ' প্রভৃতি। শেষ সংস্করণে তা করেন 'অলঙ্কারসন্নিবেশ', 'তচ্ছ্রবণে', 'সঙ্কুচিত', 'সংবাদ' প্রভৃতি। প্রথম সংস্করণে লিখেছিলেন 'চলৎশক্তি', কিন্তু শেষ সংস্করণে এর বদলে লেখেন 'গতিশক্তি'। ব্যাকরণ অনুযায়ী 'চলচ্ছক্তি' লেখা যেতো, সেটিকে তিনি কোনো

কারণে অপছন্দ করে থাকবেন। প্রথম সংস্করণে লিখেছিলেন ‘বহিঃকক্ষ’। বিসর্গ সন্ধির নিয়ম অনুযায়ী এটি হয়তো যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে বহিষ্কার বা বহিষ্করণ শব্দের অনুকরণে এটিকে তিনি লেখেন: ‘বহিষ্কক্ষ’। কিন্তু এর উচ্চারণও হয়তো শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কানকে খুশি করতে পারে না। তাই শেষ সংস্করণ নাগাদ তিনি লেখেন ‘বাহিরের ঘর’।

প্রথম সংস্করণে লিখেছিলেন ‘যথেচ্ছা’, ‘ভ্রূভঙ্গ’, ‘নিষ্কর্ম’ প্রভৃতি। শেষ সংস্করণে লেখেন ‘যথেচ্ছ’, ‘ভ্রূভঙ্গি’, ‘নিষ্কর্মা’ প্রভৃতি।

প্রথম সংস্করণে লিখেছিলেন ‘কুতূহল’, ‘গ্রন্থিত’, ‘জাগ্রত’, ‘নৈরাশ’, ‘প্রাগল্‌ভ’, ‘বিবরিত’ প্রভৃতি। শেষ সংস্করণে লেখেন ‘কৌতূহল’, ‘গ্রথিত’, ‘জাগরিত’, ‘নিরাশ’, ‘প্রগল্‌ভ’, ‘বিবৃত’ প্রভৃতি।

প্রথম সংস্করণে কয়েকটি সংযোগমূলক ক্রিয়াকে লিখেছিলেন যথা: ‘উন্মীলিত করা’, ‘উন্মোচিত করা’, ‘পর্যবেক্ষিত করা’, ‘বিন্যস্ত করা’ প্রভৃতি। শেষ সংস্করণে তার বদলে লেখেন ‘উন্মীলন করা’, ‘উন্মোচন করা’, ‘পর্যবেক্ষণ করা’, ‘বিন্যাস করা’ প্রভৃতি। এ ব্যাপারে ব্যাকরণের কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের ব্যবহার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। কেননা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী ‘ইত’ (ইতচ) প্রত্যয়টি তদ্ধিত, ‘অন’ (অনট) প্রত্যয়টি কৃৎ। তাছাড়া সংযোগমূলক ক্রিয়ার দ্বিতীয় অংশ ‘করা’ শব্দরূপটি বিশেষ্য রূপের পরে বসবে, না বিশেষণ রূপের পরে বসবে, তা নিয়েও তিনি ভেবেছেন। এভাবে প্রথম সংস্করণের ‘রোমন্থ করা’ পদবন্ধকে শেষ সংস্করণে লেখেন ‘রোমন্থন করা’, একইভাবে ‘অন্তর্ধান হওয়া’-কেও শেষ সংস্করণে লেখেন ‘অন্তর্ধান করা’।

স্ত্রীনির্দেশক প্রত্যয়ের ব্যবহার নিয়েও বঙ্কিম ভেবেছিলেন। এর ফলে প্রথম সংস্করণের অনেক স্ত্রীপ্রত্যয় শেষ সংস্করণ নাগাদ ঝরে পড়ে। আবার প্রথম সংস্করণে ছিলো না, শেষ সংস্করণের তেমন কিছু শব্দে স্ত্রীপ্রত্যয় যুক্ত হয়। এ ব্যাপারে তাঁর প্রয়োগ-আদর্শ হয়ে দাঁড়ায় এ রকম: স্ত্রীনির্দেশক বিশেষণে স্ত্রীপ্রত্যয় যুক্ত করা এবং স্ত্রীনির্দেশক ক্রিয়াবিশেষণে স্ত্রীপ্রত্যয় যোগ না করা। তাই প্রথম সংস্করণের ‘অবিশ্বাসী স্ত্রীলোক’ ও ‘প্রগল্‌ভ দাসী’ শেষ সংস্করণে হয়ে যায় ‘অবিশ্বাসিনী স্ত্রীলোক’ ও ‘প্রগল্‌ভা দাসী’। আবার প্রথম সংস্করণের ‘চকিতা হওয়া’ ও ‘ধাবমানা হওয়া’ শেষ সংস্করণে হয়ে যায় ‘চকিত হওয়া’ ও ‘ধাবমান হওয়া’।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষাকে সাধারণত তৎসমবহুল মনে করা হয়ে থাকে। তবে তিনি বহু তৎসম শব্দকে অতৎসম শব্দ দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছেন দেখে মনে হয়, এ ব্যাপারে তাঁর বিশেষ কোনো গোঁড়ামি ছিলো না। তাই তিনি প্রথম সংস্করণের ‘অদ্য’, ‘চৌর’, ‘তৎক্ষণাৎ’, ‘দৃষ্টে’, ‘পূর্বালাপকারিণী’, ‘প্রতিবন্ধক’, ‘ভিষক’, ‘যদ্যপি’ প্রভৃতি

শব্দ শেষ সংস্করণে লিখেছিলেন 'আজ', 'চোর', 'তখন', 'দেখিয়া', 'যিনি কথা কহিতেছিলেন', 'বাধা', 'হকিম', 'যদি' প্রভৃতি। এ ব্যাপারে শ্রুতিমাধুর্যের বিষয়টি তিনি মাথায় রেখেছিলেন বলে মনে হয়। সমকালীন সমালোচকদের দ্বারাও কখনো কখনো প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। যেমন প্রথম সংস্করণে 'লম্ফত্যাগে' বা 'অশ্বকে যথেচ্ছা স্থানে যাইতে দিলেন' প্রভৃতি অংশকে তিনি শেষ সংস্করণ নাগাদ লিখেছিলেন: 'লাফ দিয়া' বা 'অশ্বকে ছাড়িয়া দিলেন'।[৮]

ভাষার সরলীকরণের এই চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় সংস্করণ থেকেই করতে শুরু করেন। তার ফলে প্রথম সংস্করণের 'করিবেক', 'পারিবেক', 'যাইবেক' প্রভৃতি শব্দরূপের বদলে লেখেন: 'করিবে', 'পারিবে', 'যাইবে'। একইভাবে প্রথম সংস্করণের 'কালীন', 'নামোল্লেখমাত্র', 'যুদ্ধসমাগমে', 'এমত', 'সার্ধেক সহস্র' প্রভৃতি দ্বিতীয় সংস্করণে হয় যথাক্রমে 'কালে', 'নামমাত্রে', 'যুদ্ধে', 'এমন', 'শত শত' প্রভৃতি। প্রথম সংস্করণের সম্বোধনরূপ 'বিমলে' বা 'তিলোত্তমে' বা 'স্বামিন্' প্রভৃতি একইভাবে হয়ে দাঁড়ায় 'বিমলা', 'তিলোত্তমা', বা 'স্বামী'।

ইন্-ভাগান্ত শব্দগুলোও বঙ্কিমকে ভাবিয়েছিলো দেখা যায়। প্রথম সংস্করণে তিনি সমাস-সন্ধি তো বটেই বিভক্তিযোগের বেলায়ও হ্রস্ব ই-কারের ব্যবহার করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে বিভক্তির বেলায় তিনি আর হ্রস্ব ই-কার করেননি। যেমন প্রথম সংস্করণে লিখেছিলেন 'দুর্গবাসিরা' বা 'স্বামির' হ্রস্ব ই-কার দিয়ে, কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে লিখেছেন 'দুর্গবাসীরা' বা 'স্বামীর' দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে। এ ব্যাপারে খানিকটা বিপরীত উদাহরণ তৈরি হয় বহুবচন নির্দেশক '-গণ' বা '-সমূহ' ব্যবহারের বেলায়। প্রথম সংস্করণে তিনি 'প্রহরীগণ' লেখেন দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে, কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে লেখেন হ্রস্ব ই-কার ('প্রহরিগণ') দিয়ে।

শেষ সংস্করণ নাগাদ বঙ্কিমচন্দ্র জটিল সমাসবদ্ধতা পরিহারের চেষ্টা করেন: প্রথম সংস্করণের 'মস্তকোন্নত'-কে লেখেন 'মস্তক উন্নত'। অনেক বাক্যের পুনর্লিখন করেন, বাক্যভঙ্গি বদল করেন, কোথাও কোথাও বর্ণনাভঙ্গিরও বদল ঘটান। একটি উদাহরণ। প্রথম সংস্করণে লেখা হয়েছিলো: "কেবল একজন চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে না। সে আয়েষা।" এর বদলে শেষ সংস্করণে লেখা হয়: "আয়েষা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে না।"

৪. আদর্শিক সংস্কার

১৮৬৫ সালে প্রকাশের পরপরই গ্রাম্যতা, কুরুচি ও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার জন্য একাধিক পত্রিকা ও গ্রন্থে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের কঠোর সমালোচনা করা হয়।[৯] এইসব অভিযোগ ও সমালোচনাকে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেন এবং

সেই অনুযায়ী উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণে বেশ কিছু পরিবর্তন আনেন। এজন্য তিনি বহু বাক্য, এমনকি অনুচ্ছেদ পর্যন্ত বর্জন করেন; বহু বাক্য ও অনুচ্ছেদ পুনরায় লেখেন; আবার যাতে কোনো রকম ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়, সেজন্য নতুন কিছু বাক্য ও অনুচ্ছেদ যোগ করেন।

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের অন্তত ২৭টি জায়গা বর্জিত হয়েছে। এই জায়গাগুলোতে এমন কিছু পদবন্ধ, বাক্য বা অনুচ্ছেদ ছিলো, যা তথাকথিত অশ্লীলতা, স্থূলতা ও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিতে পারে বলে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হয়। দিগ্‌গজকে বিমলার নীচের উক্তিটি প্রসঙ্গত স্মরণীয়। এখানে বিমলার রসিকতায় অশ্লীল ইঙ্গিত রয়েছে :

> অন্য দেশে গিয়া স্ত্রীপুরুষের মত তিন জনে থাকিব। (*দুর্গেশনন্দিনী*, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৮১)

ভাঁড়ামি তথা স্থূলতার কারণে বর্জন করেছেন এমন একটি অনুচ্ছেদ নিম্নরূপ :

> নিতম্ব ধরার অপেক্ষা বৃহৎ, তাহাতে বিস্তর গাছপালা, গো মনুষ্যাদি থাকিতে পারে, কিন্তু নিকটে উরু স্বরূপ দুইটি কদলী গাছ; কদলী গাছের আওতায় অন্য গাছ গজায় না; আর পাছে কলা গাছ খাইয়া ফেলে বলিয়া বিধায় তথায় গো মনুষ্যের সৃষ্টি করেন নাই। ইত্যাদি ইত্যাদি। (দুর্গেশনন্দিনী, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৬৯)

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করতে পারে, এই বিবেচনায় বর্জন করেছেন এমন কয়েকটি অনুচ্ছেদ নিম্নরূপ। এখানে ব্রাহ্মণ দিগ্‌গজ এবং মুসলমান নারী আশমানির আন্তঃসম্পর্ক বর্ণিত:

> এ দিকে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত আশমানির পুনরাগমন না দেখিয়া বিমলা ব্যস্ত হইলেন, কুটীরমধ্যে বিমলাকে প্রবেশ করিতে দেখিবামাত্র আশমানি কহিল,
>
> "এস এস চন্দ্রাবলি এস।"
>
> দিগ্‌গজ কহিলেন, "আজ আমার সুপ্রভাত, এক জনে রক্ষা নাই, আজ দুই জনের উদয়। শাস্ত্রে লিখেছেন, "এক চন্দ্র স্তমোহন্তি, নচ মূর্খশতৈরপি।"
>
> আশমানি আবার কহিলেন, "আর শুনিয়াছ? রসিকরাজের জাত গিয়াছে।"
>
> রসিকরাজ কহিলেন, "কিসে জাত গেল?"
>
> আশমানি কহিল, "আমার উচ্ছিষ্ট খাইয়াছ।"
>
> রসিকরাজ কহিলেন, "ক্ষতি কি? ও আমার মহা প্রসাদ—তুমি আমার মা ভগবতী।"
>
> আশমানি কহিল, "মর!" (*দুর্গেশনন্দিনী*, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৭৫-৭৬)

যেসব কারণে প্রথম সংস্করণে বহু পাঠ দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত হয়েছে, একই কারণে প্রথম সংস্করণের বহু পাঠ দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণের বহু

আদিরসাত্মক বর্ণনা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসটির দ্বিতীয় সংস্করণকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তার ফলে এই উপন্যাসের একটিমাত্র চুম্বনের দৃশ্যকেও বঙ্কিমচন্দ্র বাতিল করেন। প্রথম সংস্করণের চুম্বনের দৃশ্যটি কিভাবে দ্বিতীয় ও শেষ সংস্করণে বদলে গেছে, তা নিম্নের সারণি থেকে বোঝা যাবে :

সারণি

প্রথম সংস্করণের পাঠ	২য় সংস্করণের পাঠ	শেষ সংস্করণের পাঠ
তবে শুনুন" বলিতে বলিতে বিমলা মন্মথশয্যারূপী চক্ষুর্দ্বয়ে বীরেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, "তবে শুনুন আমার উপপতি আছে।" "উপ-ছাই আছে; কোথা যাবি বল্।" "বলি।" এই বলিয়া বিমলা এক বাহু,—স্পর্দ্ধা শুন পাঠক! এক বাহু বীরেন্দ্রের গলদেশে দিলেন, অপর বাহু তাঁহার কক্ষোমধ্যে রোপণ করিলেন; বীরেন্দ্রের হৃদয়ে কাঁচলিমুক্তা স্পর্শ হইল। একবার দ্বারের দিগে নেত্রপাত করিয়া নিজরসাল ওষ্ঠাধর বীরেন্দ্রের ওষ্ঠে সংলিপ্ত করিলেন। বিমলা প্রগাঢ় মুখচুম্বন করিয়া বেগে তথা হইতে পলায়ন করিলেন। (*দুর্গেশনন্দিনী*, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৬০)	বি। "তবে শুনুন" বলিতে বলিতে বিমলা মন্মথশয্যারূপী চক্ষুর্দ্বয়ে বীরেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, "তবে শুনুন আমি দুশ্চারিণী; এখন অভিসারে গমন করিব।" এই বলিয়াই বিমলা বেগে প্রস্থান করিল। (*দুর্গেশনন্দিনী*, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৪)	"তবে শুনুন, আমি এখন অভিসারে গমন করিব।" বী। যমের সঙ্গে না কি? বি। কেন, মানুষের সঙ্গে কি হইতে নাই? বী। সে মানুষ আজিও জন্মে নাই। বি। একজন ছাড়া। এই বলিয়া বিমলা বেগে প্রস্থান করিল। (*দুর্গেশনন্দিনী*, শেষ সংস্করণ, পৃ. ৬৮)

আদর্শিক কারণে পরবর্তী সংস্করণগুলোতে নতুন পাঠ খুব কম ঢোকানো হয়েছে। এ ধরনের মাত্র চারটি সংযোজন চোখে পড়ে, যা কয়েকটি চরিত্রকে অধিক বাস্তব করে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিলো বলে মনে হয়।

৫. তাথ্যিক পরিবর্তন

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের শেষ সংস্করণে তথ্যগত বহু পরিবর্তন ঘটে। এসব পরিবর্তন মূলত স্থানগত ও কালগত। উপন্যাসের প্রথম বাক্যেই এই উভয় ধরনের পরিবর্তন লক্ষণীয়। প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে এই উপন্যাসের প্রথম বাক্য: "৯৯৮ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে এক দিন এক জন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে জাহানাবাদের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন।" শেষ সংস্করণ নাগাদ বাক্যটি হয়: "৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন।" এখানে '৯৯৮'-এর জায়গায় '৯৯৭', এবং 'জাহানাবাদ'-এর জায়গায় 'মান্দারণ' করা হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র কেন এসব পরিবর্তন করলেন? এমন প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। তখন জানতে ইচ্ছা করে, উপন্যাসটি লেখার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের কোন কোন উপাদানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং সংস্করণ করার সময়ে ইতিহাসের কোন কোন উপাদান তাঁর চোখে পড়েছিলো, যা তাকে উপন্যাসে ব্যবহৃত তথ্য পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করে।

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসের তথ্য পেয়েছিলেন তাঁর খুল্লপিতামহের নিকট থেকে।[১০] আসলে উপন্যাসটিতে যেসব তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে, তা মুদ্রিত আকারে খানিকটা পাওয়া যায় ১৭৬৮ সালে প্রকাশিত আলেকজান্ডার ডাও লিখিত দুই খণ্ডের 'হিস্টরি অব হিন্দুস্তান' গ্রন্থে এবং বেশিরভাগ পাওয়া যায় ১৮১৩ সালে প্রকাশিত চার্লস স্টুয়ার্টের 'হিস্টরি অব বেঙ্গল' গ্রন্থে।[১১] পূর্ণচন্দ্রের দাবি সত্য হলে ধরে নিতে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের খুল্লপিতামহ কোনো না কোনো ভাবে এই বই দুটিতে প্রকাশিত তথ্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তবে এমন হওয়াই স্বাভাবিক যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিজে এসব বই পড়েছিলেন এবং খুল্লপিতামহের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেছিলেন। তেমন কোনো আলোচনাই হয়তো পূর্ণচন্দ্রের স্মৃতিতে ছিলো। বঙ্কিমচন্দ্র যে শেষোক্ত গ্রন্থটি পড়েছিলেন এবং ব্যবহার করেছিলেন, তা বোঝা যায়, স্টুয়ার্টের বইয়ের স্থাননাম ও ব্যক্তিনামের বানান তাঁর উপন্যাসে প্রায় একই রকম ব্যবহৃত হয়েছে দেখে। যেমন স্টুয়ার্টের ইতিহাসে মানসিংহ সম্পর্কে লেখা হয়েছে 'রাজা কিনোড় মানসিংহ অব আবনীর'; বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে লিখেছেন 'কিনোড় ও আবনীরপতি'। উপন্যাসের শেষ সংস্করণে এসে বঙ্কিমচন্দ্র এই 'কিনোড়' শব্দটি বর্জন করেছিলেন এবং 'আবনীরপতি'-র জায়গায় 'অম্বরপতি' লিখেছিলেন। একইভাবে উপন্যাসের '৯৯৮' এবং 'জাহানাবাদ' স্টুয়ার্টের গ্রন্থ থেকেই নেওয়া।[১২]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে ব্যবহৃত এসব ঐতিহাসিক তথ্যাদিকে যাচাই করার সুযোগ পেয়েছিলেন ১৮৮০-এর দশকে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত একাধিক

প্রবন্ধ এবং আবুল ফজলের 'আকবরনামা' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের পর। ঐ সময়ে ফ্রেডরিক অগাস্টাস রচিত 'দি এমপেরর আকবর' বইটিতে উপস্থাপিত তথ্যাদির সঙ্গে উপন্যাসের নতুন সংস্করণে উপস্থাপিত তথ্যাদির মিল পাওয়া যায়।[১৩]

উপন্যাসের শেষ সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্রের কালগত তথ্যের পরিবর্তনটি যৌক্তিক কারণেই তাঁকে করতে হয়েছিলো। এই উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত সালগুলো ছিলো: ৯৯৮ বঙ্গাব্দ, ৯৩২ শাল, ৯৮২ শাল, ৯৮৬ শাল এবং ৯৯৭ শাল। শেষ সংস্করণে এই সালগুলো হয়ে যায় যথাক্রমে : ৯৯৭ বঙ্গাব্দ, ৯৭২ হেঃ অব্দ, ৯৮২ হেঃ অব্দ, ৯৮৬ অব্দ এবং ৯৯৬ সাল। স্টুয়ার্টের যে বই থেকে তিনি কালগত তথ্যাদি নিয়েছিলেন বলে মনে হয়, সেখানকার সব সাল হিজরি। বঙ্গাব্দের অব্দসংখ্যার সঙ্গে হিজরি অব্দসংখ্যার মিল-অমিলের বিষয়টি তিনি হয়তো শেষ সংস্করণ নাগাদ বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। ৯৬৩ হিজরি এবং ৯৬৩ বঙ্গাব্দের অব্দসংখ্যা অভিন্ন হলেও গণনা-পদ্ধতির তফাতের কারণে প্রতি ৩৩/৩৪ বছরে হিজরি অব্দ ও বঙ্গাব্দের এক বছরের ব্যবধান তৈরি হয়। তাই ৯৯৮ থেকে ৯৬৩-এর ব্যবধান ৩৫ হওয়ায় শেষ সংস্করণের সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের প্রথম বাক্যটির বঙ্গাব্দ ঠিক রাখতে গিয়ে এর অব্দসংখ্যায় ১ অঙ্কের পরিবর্তন ঘটান। ৯৩২ শালটি প্রথম সংস্করণেরই মুদ্রণপ্রমাদ, শেষ সংস্করণে তা সংশোধন করে লেখা হয় ৯৭২ হেঃ অব্দ। ৯৮২ শালকেও তিনি হেঃ অব্দ করেন। ৯৮৬ শালকে লেখেন ৯৮৬ অব্দ। এই সাল তিনটিকেও বঙ্গাব্দ লেখা যেতো। কিন্তু ৯৯৭ হিজরিকে তা করা সম্ভব নয় বলেই তিনি তাঁর উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের ৯৯৭ শালকে শেষ সংস্করণে লেখেন ৯৯৬ সাল। অর্থাৎ এই সালটি নিঃসন্দেহে বঙ্গাব্দের সাল। ৯৮২ বা ৯৮৬ সালকে হিজরিও ধরা যায় আবার বঙ্গাব্দও ধরা যায়।

স্থাননাম পরিবর্তনের মধ্যে প্রধান হলো 'জাহানাবাদ' স্থলে 'মান্দারণ'। প্রথম সংস্করণের 'জাহানাবাদ' স্থাননামটি স্টুয়ার্টের বইয়ের প্রভাবজাত। অন্য উৎসাদি থেকে নিশ্চিত হওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র এই স্থাননামটিকে 'মান্দারণ' হিসেবে সংশোধন করেন।

ব্যক্তিনামেও পরিবর্তন চোখে পড়ে। প্রথম সংস্করণের এক জায়গায় লেখা হয়েছে দুর্গের নির্মাতা একজন হিন্দু সৈনিক। কিন্তু শেষ সংস্করণে লেখা হয়, দুর্গের নির্মাতা ছিলেন পাঠান সম্রাট হোসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজি। সমকালীন প্রামাণ্য কোনো প্রকাশনা হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রকে এমন পরিবর্তনে উৎসাহিত করে।

একটি পরিবর্তন খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না। যেমন কতলু খাঁ উড়িষ্যার বাইরে বিষ্ণুপুর দখল করেছিলেন কিনা। কিন্তু শেষ সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র সেটাও সংশোধন করেন। প্রথম সংস্করণে লেখা হয়: কতলু খাঁ উড়িষ্যার বাইরে মেদিনীপুর ও বিষ্ণুপুর দখল করেছিলেন। কিন্তু শেষ সংস্করণ নাগাদ বঙ্কিমচন্দ্র এই তালিকা থেকে বিষ্ণুপুরকে বাদ

দেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, আবুল ফজলের আকবরনামায় উল্লেখ করা রয়েছে যে বিষ্ণুপুরের রাজা হাম্বীর জাহাঙ্গীরের সময় পর্যন্ত স্বীয় জমিদারিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১৪]

৬. উপসংহার

ভাষার ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রের খুঁতখুঁতে স্বভাবের কথা জানাতে গিয়ে জীবনীকার শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন : "বঙ্কিমচন্দ্র নিয়ত পরিবর্তন করিতেন – লিখিবার সময়ে করিতেন – পরদিন করিতেন – ছয় মাস, এক বৎসর পরেও করিতেন। যতক্ষণ কথাটি তাহার পছন্দসই হইত – যতক্ষণ না ভাবটি তাহার মনঃপূত হইত ততক্ষণ তিনি পরিবর্ত্তন করিতেন। একটা কথা বা একটা ভাব লইয়া এতটা সময় ব্যয় করিতে আমি অপর কাহাকেও দেখি নাই।"[১৫] 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের সংস্করণগুলোতে এর সমর্থন পাওয়া যায়। প্রথম সংস্করণের বহু শব্দ তাই দ্বিতীয় সংস্করণে ভিন্ন শব্দ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়, আবার শেষ সংস্করণ নাগাদ সেখানে হয়তো অন্য একটি শব্দ চলে আসে। বাক্যের বিন্যাসেও এমন পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। উপন্যাসটির সবগুলো সংস্করণে ভাষাগত এই পরিবর্তন অব্যাহত থাকলেও আদর্শিক কারণে বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটান প্রধানত দ্বিতীয় সংস্করণে, আর তাথ্যিক কারণে এই উপন্যাসের ব্যাপক পরিবর্তন হয় উপন্যাসটির শেষ সংস্করণে।

বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট কম বয়সে মারা গিয়েছিলেন। তিনি যদি অন্তত রবীন্দ্রনাথের মতো আয়ু পেতেন, তাহলে তিনি হয়তো 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের আরো কোনো সংস্করণ করতেন। পরবর্তী কালে মুসলমান সমাজের প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিও হয়তো তিনি মাথায় রাখতেন। হয়তো আরো কোনো নতুন তথ্য দিয়ে উপন্যাসকে আরো পুষ্ট করে তুলতেন, ভাষা হয়তো আরো আকর্ষণীয় হতো। তা না হলেও, তাঁর জীবদ্দশায় একটি উপন্যাসের এতোগুলো সংস্করণের মধ্য দিয়ে যে উদাহরণ তিনি সৃষ্টি করেছেন, যেভাবে ধীরে ধীরে একটি উপন্যাসকে তিনি পূর্ণতার দিকে নিয়ে গেছেন, সেই প্রক্রিয়াটি আমাদের মুগ্ধ করে। এই উদাহরণ আমাদের সৃজনশীল লেখকদের অনুপ্রাণিত করুক, এই কামনা।

তথ্যনির্দেশ

১. শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিমজীবনী*, অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৮৮), পৃ. ২০১-০২।

২. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *বঙ্কিমসাহিত্য* (কলকাতা : সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৮), "ভূমিকা"।

৩. সারোয়ার জাহান, *বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : মূল্যায়নের পালাবদল, ১৮৬৫-১৯০৩* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫), পৃ. ১৯৮।

৪. বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠসম্পাদনা নিয়ে বর্তমান লেখকের একটি প্রবন্ধ এই আলোচনার পরিপূরক। প্রবন্ধটির জন্য দ্রষ্টব্য, "বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠসম্পাদনা: দুর্গেশনন্দিনীর উদাহরণ," অন্তর্ভুক্ত, স্বরোচিষ সরকার, *বাংলাদেশের কোষগ্রন্থ ও শব্দসন্ধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১০), পৃ. ১০৩-১৪৪।

৫. কোনো কিছু মুদ্রণের সময়ে প্রেস কপির যে অংশ প্রুফ কপিতে মুদ্রিত হয় না, সেটাকে "ছাড়" বলে।

৬. শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিমজীবনী*, অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৮৮); অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্কিম সাহিত্যের প্রতিক্রিয়া : সমকাল ও উত্তরকাল* (বর্ধমান : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯)।

৭. এই আলোচনায় প্রথম সংস্করণ বলতে ১৮৬৫ সালের মুদ্রণ, দ্বিতীয় সংস্করণ বলতে আনুমানিক ১৮৬৭ সালের মুদ্রণ এবং শেষ সংস্করণ বলতে ১৮৯৩ সালের মুদ্রণকে বোঝানো হয়েছে। প্রথম দুটির পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর গ্রন্থাগার থেকে এবং শেষেরটি যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত রচনাবলির প্রথম খণ্ড থেকে।

৮. প্রসঙ্গত স্মরণীয়, *রহস্যসন্দর্ভ* পত্রিকায় 'লম্ফত্যাগ' শব্দের ব্যবহার নিয়ে তখন সমালোচনা হয়। দ্রষ্টব্য, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *বঙ্কিমসাহিত্য*, পৃ. ২৮।

৯. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, সারোয়ার জাহান, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : মূল্যায়নের পালাবদল, পৃ. ৪১-৪২।

১০. যোগেশচন্দ্র বাগল, "উপন্যাস প্রসঙ্গ", পৃ. আটাশ।

১১. Alexander Dow, *The History of Hindustan,* 2 Volumes (London : T Bechet, 1768); Charles Stewart, *History of Bengal* (London, 1813).

১২. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, লেখকের, "বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠসম্পাদনা: দুর্গেশনন্দিনীর উদাহরণ," পৃ. ১৩৬-৩৭।

১৩. Fredrick Augustus, *The Emperor Akbar* (Reprint; Patna: Academia Asiatica, 1971; First Published in 1881).

১৪. দ্রষ্টব্য, আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস: মোগল আমল* (রাজশাহী : ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৯২), পৃ. ১৫৯।

১৫. শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিমজীবনী*, পৃ. ১৯১-৯২।